হোলেও দলত্যাগ বন্ধ করতে পারেনি।

উপসংহারে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, যতক্ষণ সাংসদ বা বিধায়কদের মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটছে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁরা সচেতন না হোচ্ছেন, ততক্ষণ কোন আইনই এই সমস্যা সমাধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। যে দেশের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের অধিকারগুলিকে ঘিরে দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে দর-কষাকষির খেলা চলে সেখানে কোনো আইনী ব্যবস্থাই সফল হোতে পারে না।

১.৭ জোট-রাজনীতি (Coalition Politics) ঃ

জার্মানীর প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ বিসমার্ক (Bismarck) একসময় মন্তব্য করেছিলেন, "Politics is the art of possible" অর্থাৎ, রাজনীতি হোচ্ছে এমন একটি বিষয় যেখানে সম্ভাব্য পরিস্থিতির কলাকৌশল নির্দ্ধারণ করা হয়। বর্তমান ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণিত হোয়েছে। অধিকাংশ রাজনৈতিক দলগুলি তাদের জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে এবং আঞ্চলিক স্তরের সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈচিত্র্য এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে যেখানে কোনো রাজনৈতিক দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হোচ্ছে না।

কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে মন্ত্রীপরিষদ চালিত শাসন ব্যবস্থায় তাই দেখা দিয়েছে বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে জোট বেঁধে সরকার গঠন করার প্রবণতা। ভারতের মতো বহু জাতি, জাত-পাত ও বিবিধ সংস্কৃতি সম্পন্ন দেশে জোট-রাজনীতির উদ্ভব অস্বাভাবিক বা বিচিত্র নয়।

সাধারণ অর্থে জোট বলতে বোঝায় বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়া। প্রয়োজনের তাগিদে বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলনের সূত্রে আবদ্ধ হোয়ে মৈত্রী স্থাপনের প্রয়াস হোচ্ছে জোট গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনীতির ক্ষেত্রে যখন "জোট" শব্দটি প্রয়োগ করা হয় তখন তার অর্থ হোয়ে দাঁড়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে উদ্দেশ্য ও নীতির পার্থক্যগুলি সাময়িকভাবে দূর করে প্রয়োজনের তাগিদে অর্থাৎ সরকার গঠনের জন্য সংহতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। রাজনীতিতে জোট সরকার বলতে কি বোঝায় তা অধ্যাপক এফ.এ.অগ্ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে "Coalition is a cooperative arrangement under which distinct political parties or.....members of such parties unite to form a government or ministry" অর্থাৎ, জোট সরকার হোচ্ছে এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল অথবা তাদের সদস্যরা সরকার বা মন্ত্রীসভা গঠনের উদ্দেশ্যে সহযোগিতার ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। জোট সরকারের প্রয়োজনীয়তা তখনই দেখা দেয় যখন কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে একক ভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা সম্ভব হয় না। তাই, বিভিন্ন দলের সংমিশ্রণে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করা অনিবার্য হোয়ে পড়ে।

জোট সরকার আবার প্রধানত দুধরনের হোতে পারে। একটি হোচ্ছে, নির্বাচনের পূর্ব্বেই বিভিন্ন দল সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ হোয়ে নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে কতকগুলি স্বীকৃত নীতি বা কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। এই জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে সফল হোলে জোট সরকার গঠন করে। অন্যটি হোল, নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার পর যদি দেখা যায় যে, একক ভাবে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি, তবে জোট গঠন করে গরিষ্ঠতা অর্জনে সফল হোয়ে সরকার গঠন করা। ভারতে অনেক সময় দেখা গেছে যে, রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপাল

কোনো একটি জোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হোলেও সাময়িকভাবে সরকার গঠনের সুযোগ দিয়ে অবিলম্বে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের নির্দেশ দান করেছেন। অনেক সময় আবার জোট-গঠন কৌশল এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে যেখানে যে দল সব থেকে বেশি আসন লাভ করেছে অথচ গরিষ্ঠতা অর্জন করেনি, সেই দলকেই সরকার গঠনের সুযোগ দেওয়া হয়। অন্যান্য কয়েকটি রাজনৈতিক দল সরকারে অংশগ্রহণ না করে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলে, সেই সরকার গরিষ্ঠতা অর্জনে সাময়িকভাবে সক্ষম হয়। যেমন ১৯৭৯ সালে চরণ সিং সরকার গঠন করলে কংগ্রেস (ই) বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করেছিল।

জোট-সরকারের যে ধারণা উপরে ব্যাখ্যা করা হোল, তা থেকে এই সরকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি সুস্পষ্ট হোয়ে ওঠে ঃ

(১) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল ও ভোগ করার উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য জোট সরকারের মূল বৈশিষ্ট্য হোল যে, এখানে এক সহযোগিতামূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এই সহযোগিতার ভিত্তি কিন্তু গভীর নয় কারণ, জোটে সামিল প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজের পৃথক অস্তিত্ব রক্ষা করে। জোটের অন্তর্ভুক্ত দলগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য পুরোপুরি ত্যাগ করে না। একটি সাময়িক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই জোট-সরকার গড়ে ওঠে।

(২) জোট-রাজনীতির সিদ্ধান্ত নির্বাচনের পূর্বে বা পরে গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রাক্ নির্বাচনী জোট কতকগুলি স্বীকৃত নীতি ও কর্মসূচীর ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। ফলে, ভোটের প্রার্থী নির্বাচন, নির্বাচনী ইস্তাহার রচনা ও প্রচার কার্য জোট-সঙ্গীদের সমবেতভাবে করতে হয়। নির্বাচনের পরে যখন জোট গঠন করা হয় তখন দেখা যায় যে, সেটি ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য দ্বারা অধিক প্রণোদিত। এইরূপ জোটে রাজনৈতিক মতাদর্শ নয় কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থ বড়ো করে দেখা হয়। ক্ষমতা দখলের লোভে ও পরিস্থিতির চাপে পড়ে জোটসঙ্গীরা ঐক্যবদ্ধ হোতে বাধ্য হয়।

(৩) কোনো একটি রাজনৈতিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় যে সরকার গঠিত হয় তার থেকে জোট সরকার তুলনামূলকভাবে অস্থায়ী। যেহেতু সহযোগিতার ভিত্তি সুদৃঢ় নয় এবং সাময়িক, সেহেতু যে কোনো সময় জোট-সরকারের পতন ঘটতে পারে। জোটে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে নানা কারণে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে। ফলে, জোটসঙ্গীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই কারণে শরিক দলগুলি জোটের বাইরে গিয়ে দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অন্য আর এক জোট গঠনের চেষ্টা করতে পারে। এই কারণেই জোট-সরকার হোল অস্থায়ী ও সাময়িক প্রকৃতির ব্যবস্থা। নব্বই-এর দশকে ভারতে জাতীয় স্তরে জোট-সরকারের অনিশ্চয়তা ও ভঙ্গুর প্রকৃতি বিশেষভাবে প্রমাণিত, হোয়েছে। উপর্যুপরি কয়েকটি সরকার ক্ষমতায় এসেছে এবং চলে গেছে। এইসব সরকারের দৃষ্টান্ত প্রমাণ করে যে, জোট-সরকার অনেক সময়েই যেন ক্ষণিকের অতিথি।

(৪) জোট-রাজনীতির ফলে অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে অশুভ আঁতাত গড়ে ওঠে। জোট গঠনের মূল উদ্দেশ্য হোয়ে দাঁড়ায় শত্রু রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা বা সরকার গঠনে বাধা দেওয়া। এমন বহু দৃষ্টান্ত ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে দেখা গেছে যেখানে বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী দলগুলি শুধু ক্ষমতার লোভে বা সাধারণ দলীয় শত্রুকে শায়েস্তা করতে জোট গঠন করেছে। অনেক জোটে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি হাত মিলিয়েছে উভয়ের বিশেষ স্বার্থ সিদ্ধি করার জন্য। ফলে রাজনৈতিক দলগুলি প্রয়োজনমতো এক জোট ছেড়ে অন্য জোট গঠন করতে দ্বিধা করেনি।

জোট-সরকারের ইতিহাস, পটভূমি ও বিবর্তন ঃ

জোট-সরকারের অভিজ্ঞতা প্রাচীন। ইংল্যাণ্ডে ১৮৫২ সালে জোট-সরকারের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পরে ১৮৯৫ সালে Liberal Unionists এবং Conservatives-এর মধ্যে জোট দেখা দেয় Lord Salisbury-র মন্ত্রীত্বে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নেতৃত্বে জোট-সরকার গঠন করা হোয়েছিল। পরবর্তীকালে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে জোট-সরকারের বহু দৃষ্টান্ত দেখা গেছে।

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, স্বাধীনতা অর্জনের প্রাক্কালে ১৯৪৬ সালে মুসলিম লীগ, কংগ্রেস, অকালি দল প্রভৃতির ১৪ জন সদস্য একটি জোট-সরকার গঠন করে। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে এটি ছিল প্রথম জোট-সরকার যা স্থায়ী হোয়েছিল নয় মাস। এই জোটে অংশগ্রহণকারী দলগুলির মধ্যে ছিল মৌলিক উদ্দেশ্যগত পার্থক্য। একদিকে মুসলিম লীগ ভারত বিভাগের আদর্শে ছিল উদ্বুদ্ধ, অন্যদিকে কংগ্রেস ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল। স্বভাবতই জোট সরকারের প্রথম অভিজ্ঞতা ছিল তিক্ত, কারণ এই জোট স্থায়ী বন্ধুত্বের মনোভাব সৃষ্টি না করে সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্যে ভাগ ও বন্টনের মনোভাব সৃষ্টি করেছিল। এই দূষিত আবহাওয়া সৃষ্টির পিছনে ছিল লিয়াকৎ আলীর নেতৃত্ব ও ভূমিকা।

স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতে ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত ছিল কংগ্রেস দলের একাধিপত্য। যদিও কংগ্রেস দলের নীতিগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মতাদর্শের সংমিশ্রণ ছিল তবু এই দল সুদীর্ঘ ১৫ বছর ধরে সংখ্যালঘু ভোট পেয়েও অধিক সংখ্যক আসনে জয়লাভ করে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠার নজীর সৃষ্টি করেছিল। ১৯৬৭ সালের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকেই ভারতীয় রাজনীতিতে জোট-সরকার গঠনের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

জোট-রাজনীতির উদ্ভব ও বিকাশের পিছনে কতকগুলি প্রধান কারণ আছে।

প্রথমত, ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে কোনো একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনের সম্ভাবনা ধীরে ধীরে হ্রাস পেয়েছে। ভারতীয় সমাজের গতিশীলতা সৃষ্টি করেছে স্তর-বিন্যস্ত জাত-ভিত্তিক কাঠামো, গ্রাম-শহরের বিভাজন, অসম অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ইত্যাদি শক্তিগুলির উপর ভিত্তি করে সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবাদের মনোভাব। স্বভাবতই এই সামাজিক পরিস্থিতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক দল, যার জন্য কংগ্রেস বা অন্য কোনো দলের পক্ষেই এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করা ক্রমশ অসম্ভব হোয়ে উঠেছে।

দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস দলের দীর্ঘ শাসনকাল ভারতে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব রক্ষা করতে সমর্থ হোলেও দেশের জনগণের বিভিন্ন চাহিদা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হোয়েছে। কংগ্রেস দলের কর্তৃত্ববাদী আচরণ পরোক্ষভাবে আঞ্চলিকতার মনোভাবকে উৎসাহিত করেছে। ফলে, কংগ্রেস দলের বিকল্প সরকার স্থাপনের অভিপ্রায় জনগণের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ এর বিকল্প কোনও একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় নি। সর্বভারতীয় স্তরে এমন কোনো দল গড়ে ওঠেনি যা কংগ্রেসের কার্যকরী বিকল্প হিসাবে শাসন করতে সক্ষম। তাই একদিকে কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব অন্যদিকে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির অক্ষমতা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি

করেছে যেখানে একমাত্র জোট-গঠনের মাধ্যমেই কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করা সম্ভব বলে মনে করা হোয়েছে।

তৃতীয়ত, কংগ্রেস দলের মতাদর্শ শুরু থেকেই নমনীয়তার পরিচয় দিয়ে এসেছে। এই জন্যই কংগ্রেস দলকে এক বিরাট ছাতার সঙ্গে তুলনা করা হোয়ে থাকে যার নীচে বিভিন্ন আদর্শে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিরা আশ্রয় নিয়েছে। কংগ্রেস দলের মতাদর্শগত নমনীয়তার সুযোগ নিয়ে অনেক রাজনৈতিক নেতারা এই দল থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে গিয়ে নিজেদের পছন্দমতো দল গড়ে তুলেছেন। কংগ্রেস দল থেকে উদ্ভূত এই দলগুলি বিকল্প দৃষ্টিভঙ্গী বা আদর্শ সৃষ্টি করতে পারেনি। যা করতে পেরেছে তা হোল কংগ্রেসের মধ্যে উপদল সৃষ্টি, যার পরিণতি ছিল দলীয় ভাঙ্গন। ভোটদাতারা তাই বিকল্প কর্মসূচী বা নীতির সন্ধান না পেয়ে আঞ্চলিক মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে ভোটদান করেছেন। ফলে, কোনো একটি দলের পক্ষেই অধিকসংখ্যক আসন লাভ করা সম্ভব হয়নি। যা ঘটেছে তা হোল ভোটের ভাগাভাগি ও বহু দুর্বল রাজনৈতিক দলের উদ্ভব। এই পরিস্থিতিতে জোট-সরকার হোয়ে উঠেছে অনিবার্য পরিণতি।

চতুর্থত, সমসাময়িক ভারতীয় রাজনীতির এক বিশেষ সমস্যা হোল সৎ, সুশৃংখল ও উৎসর্গীকত নেতৃবৃন্দের অভাব। স্বাধীনতার পর এমন কিছু ব্যক্তি রাজনীতিতে ছিলেন যাঁদের সুদক্ষ নেতৃত্ব সমগ্র ভারতীয় রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তাঁদের অনুপস্থিতি ধীরে ধীরে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে যেখানে সমগ্র দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য নেতা প্রায় নেই বললেই চলে। ফলে, গড়ে উঠেছে আঞ্চলিক স্তরে অজস্র নেতৃবৃন্দ। তাই একদিকে নেতাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, অন্যদিকে তাদের গুণগত মান হ্রাস পেয়েছে। এই অবস্থায় কোনো দলই সফলভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে নি। নর্মান পামার, মাইরন ওয়েনার প্রমুখ লেখকগণ মনে করেন যে, রাজ্যস্তরে মাত্রাতিরিক্তভাবে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে জাতীয় স্তরে। এই জন্যই কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় স্তরেই জোট-গঠনের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেন্দ্রীয় স্তরে জোট-রাজনীতি (Coalition Politics at the Centre) ঃ

কংগ্রেস দলের প্রাধান্য খর্ব করে কেন্দ্রে প্রথম জোট-সরকার গঠন করে জনতা দল। ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলকে ক্ষমতাচ্যুত করে কেন্দ্রে জনতা দল ক্ষমতা দখল করে। জনতা দল ছিল কয়েকটি রাজনৈতিক দলের জোট, যাদের মধ্যে ছিল জনসংঘ, ভারতীয় লোকদল, কংগ্রেস (সাংগঠনিক), কংগ্রেস ফর ডেমোক্র্যাসী, সোসালিস্ট পার্টি ইত্যাদি দলগুলি। এই দলগুলি নির্বাচনের পূর্বেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে জোট গঠন করে। তাই একই নির্বাচনী প্রতীক ও নির্বাচনী ইস্তাহারের ভিত্তিতে জনতা দল নির্বাচনে অংশ নেয়। এই নির্বাচনে মোট ৩০১টি আসন সংগ্রহ করে জনতা দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এবং মোরারজী দেশাইয়ের নেতৃত্বে প্রথম জোট সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসে। অনেকে মনে করেন যে, জনতা সরকার জোট-সরকারের যথার্থ দৃষ্টান্ত নয়, কারণ এর শরিক দলগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই দলের মধ্যে একতার অভাব ও ক্ষমতার লড়াই অচিরেই দেখা দেয়। প্রধানমন্ত্রী দেশাই যে ক্যাবিনেট গঠন করেন তাতে তাঁর সমর্থকরাই মূলত স্থান পান। জনতা দলের জোটসঙ্গীদের মধ্যে প্রবল দলাদলি ও মতানৈক্যের পরিণতি হোল জর্জ ফারনান্ডিজ, এইচ. এন. বহুগুণা, বিজু

পট্টনায়ক, মধু লিমায়ে প্রমুখ নেতারা জোট-সরকার থেকে সরে দাঁড়ান। অকালি দল, এ.আই. এ.ডি.এম.কে-র মতো আঞ্চলিক গোষ্ঠী যারা শুরুতে জনতা দলকে সমর্থন করেছিল তারাও সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। ফলে, ১৯৭৯ সালে তাসের ঘরের মতো জনতা জোট-সরকার ভেঙ্গে পড়ে।

কেন্দ্রে দ্বিতীয় জোট-সরকার ক্ষমতায় আসে চরণ সিং-এর নেতৃত্বে ১৯৭৯ সালে। এই জোটে শরিক দল বা ব্যক্তিরা ছিলেন পরস্পর বিরোধী মতাদর্শে বিশ্বাসী। একদিকে যেমন বামপন্থী দল সি.পি.আই ও সি.পি.আই (এম) অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণপন্থী ও পশ্চিমী শক্তির সমর্থকগণও এই জোটে সামিল হোয়েছিল। জোটসঙ্গীদের মধ্যে প্রভাবশালী দল কংগ্রেস (ই) সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় চরণ সিং পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি রেড্ডাকে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের আয়োজন করতে পরামর্শ দেন। ১৯৮০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ফলে, জোট-সরকারের যুগ সাময়িকভাবে শেষ হয়।

কেন্দ্রে তৃতীয় জোট-সরকার গঠিত হয় ১৯৮৯ সালে নবম লোকসভা নির্বাচনের পর। এই নির্বাচনের পূর্বেই জনতা পার্টি, লোকদল(বি), জনমোর্চা, কংগ্রেস(স) ইত্যাদি দলগুলি জোটসঙ্গী হিসাবে জাতীয় ফ্রন্ট (National Front) গঠন করে। নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কু (Hung) লোকসভার সৃষ্টি করে। কংগ্রেস (ই) দল একক বৃহত্তম দল হিসাবে স্বীকৃতি পায়। জাতীয় ফ্রন্ট দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কংগ্রেস (ই) দল সরকার গঠনে অনিচ্ছা প্রকাশ করায় রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ জাতীয় ফন্টকে সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানান। ভি. পি. সিং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্রে পুনরায় জোট-সরকার গঠিত হয়। রাষ্ট্রপতি ৩০ দিনের মধ্যে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারকে লোকসভায় আস্থা ভোটে জয়ী হওয়ার নির্দেশ দেন। বি.জে.পি. এই জোট-সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দান করে। এইভাবে ১৯৮৯ সালে নবম লোকসভা নির্বাচনের পর কেন্দ্রে সর্বপ্রথম সংখ্যালঘু জোট-সরকারের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস বিরোধী দলগুলি সরকারে যোগ না দিয়ে বাইরে থেকে সমর্থনে রাজী হওয়ায় কার্যত জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের পিছনে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদদের সমর্থন ছিল। এই জোট-সরকারকে সমর্থন করার প্রধান রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটানো। এই জোট-সরকারের স্থায়িত্ব ছিল প্রায় একটি বছর। ৩০শে অক্টোবর, ১৯৯০ সালে বাজপেয়ীর নেতৃত্বে বি.জে.পি-র এক প্রতিনিধি দল রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জাতীয় ফ্রন্ট সরকারের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ৭ই নভেম্বর, ১৯৯০ সালে ভি. পি. সিং-এর জোট-সরকার আস্থা ভোটে লোকসভায় পরাজিত হয়। ফলে, এই জোট-সরকার লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করতে ব্যর্থ হওয়ায় পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

তৃতীয় জোট-সরকারের পতনের ঠিক পরেই চন্দ্রশেখর সরকার গঠন করার জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে দাবী জানান। তাঁর জোটসঙ্গীদের মধ্যে ছিল প্রধানত কংগ্রেস (ই), এ.আই.এ.ডি.এম.কে, মুসলিম লীগ, জম্মু-কাশ্মীরের ন্যাশানাল কনফারেন্স ইত্যাদি। রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমণ মনে করেন যে, জাতীয় স্বার্থে লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচন গ্রহণ করা যুক্তিসংগত নয়, তাই তিনি চন্দ্রশেখরকে সরকার গঠনে আমন্ত্রণ জানান। পরে রাষ্ট্রপতির এই পদক্ষেপ সমালোচিত হয় কারণ অনেকেই মনে করেন যে, চন্দ্রশেখরকে সরকার গঠন করতে আহ্বান জানানোর অর্থই হোল দলত্যাগের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া।

চন্দ্রশেখরের নেতৃত্বে কেন্দ্রে চতুর্থ জোট-সরকার মাত্র চার মাস স্থায়ী হয়। দেশের অর্থনৈতিক সমস্যা, বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি ঘটনাকে কেন্দ্র করে চন্দ্রশেখর ও কংগ্রেস (ই) নেতা রাজীব গান্ধীর মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত চন্দ্রশেখর রাষ্ট্রপতির কাছে পদত্যাগ পত্র পেশ করতে বাধ্য হন। এই পত্রে তিনি লোকসভা ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচনের আয়োজন করার পরামর্শ দেন। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি। একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে নরসিম্হা রাওয়ের নেতৃত্বে সংখ্যালঘু সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বাইরে থেকে কিছু দল এই সরকারকে সমর্থন করে। উপর্যুপরি অস্থায়ী সরকারের দৃষ্টান্তের পর এই সরকার পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করতে সক্ষম হয়।

১৯৯৬ সালের একাদশ লোকসভা নির্বাচন প্রমাণ করে দিল যে, ভারতীয় রাজনীতিতে জোট-সরকারের যুগ অনিবার্য। পুনরায় ত্রিশঙ্কু (Hung) লোকসভা দেখা দিল। এই নির্বাচনের ফলাফল ছিল আগের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির। কংগ্রেস (ই) ও বি.জে.পি দল প্রায় ৩০০টি আসন লাভ করে। অন্যান্য জাতীয় দলগুলি—যেমন জনতা দল, বামপন্থী দল ইত্যাদি ১০২টি আসন পায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার মতো ঘটনা হোল যে, আঞ্চলিক ও অন্যান্য ছোটো দলগুলি মোট ১৪০টি আসনে জয়ী হয়। ফলে, আঞ্চলিক দলগুলি সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে শুরু করে।

১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ফলাফলের অনিবার্য পরিণতি হোল কেন্দ্রে পঞ্চম জোট-সরকারের আবির্ভাব। ভারতীয় জনতা পার্টি এই নির্বাচনে বৃহৎ দল হিসাবে দেখা দেয়। এই দলের নেতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রীত্বে যে সরকার গঠিত হয় তা ছিল এই সময়ে জোট-সরকারের প্রথম দৃষ্টান্ত। কিন্তু লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় মাত্র ১৩ দিন পর এই সরকারের পতন ঘটে।

এই সময়ের দ্বিতীয় জোট-সরকার গঠিত হয় এইচ. ডি. দেবেগৌড়ার নেতৃত্বে। এই যুক্তফ্রন্ট সরকারে ১৩টি অন্যান্য গোষ্ঠী যোগ দেয়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল যে, দেবেগৌড়ার জোট-সরকার যেন একটি রথের সামিল যার যাত্রাপথে ১৩টি ঘোড়া বিভিন্ন দিকে রথটিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। এই জোটের সমর্থনকারী দলগুলির মধ্যে প্রধান ছিল কংগ্রেস (ই)। কংগ্রেস (ই) সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এই সরকারের পতন ঘটে। এই সরকারের প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে Kochanek মন্তব্য করেছিলেন "This United Front was neither united nor a front....It was disunited on basic issues".

অতঃপর এই সময়ের তৃতীয় জোট-সরকার আত্মপ্রকাশ করে গুজরালের নেতৃত্বে। পুনরায় কংগ্রেস (ই) এই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দেয়। অনতিবিলম্বে কংগ্রেস দল প্রধানমন্ত্রী গুজরালের কাছে দাবী জানায় যে, জোট সরকার থেকে D.M.K. মন্ত্রীদের সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী এ কাজে সম্মতি না দেওয়ায় কংগ্রেস (ই) সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং জোট-সরকার পদত্যাগ করে।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে, একাদশ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল মোট তিনটি জোট সরকারের উত্থান ও তাদের অবিলম্বে পতন ঘটিয়েছিল। এই তিনটি জোটের নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে বাজপেয়ী, দেবেগৌড়া ও গুজরাল।

১৯৯৮ সালে দ্বাদশ লোকসভার নির্বাচনের ফলাফল রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার পক্ষে অনুকূল ছিল না। আবার ত্রিশঙ্কু (Hung) লোকসভার সৃষ্টি হয়। মোট ১৮২টি আসন লাভ করে ভারতীয় জনতা পার্টি বৃহত্তম একক দলের মর্যাদা পায়। ১৪০টি আসন সংগ্রহ করে কংগ্রেস দল দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। নির্বাচনের পূর্বেই বি.জে.পি-র সঙ্গে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলি যেমন — পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস, বিহারের সমতো পার্টি, তামিলনাড়ুর ডি.এম.কে ও এ.আই.এ.ডি.এম.কে প্রভৃতির সঙ্গে বোঝাপড়া গড়ে উঠেছিল। এইসব আঞ্চলিক দলগুলি সমর্থন করায় বি.জে.পি নেতা বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ষষ্ঠ জোট-সরকার গঠিত হয়। এই জোট-সরকারের পিছনে লোকসভার মোট ২৬১ জন সদস্যের সমর্থন ছিল। দুঃখের বিষয়, এই জোটে আঞ্চলিক দলগুলির প্রাধান্য অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাওয়ায় জাতীয় কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ করা সরকারের পক্ষে কঠিন হোয়ে পড়ে। সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে তীব্র সমস্যা দেখা দেয় যখন শরিক দল এ.আই.এ.ডি.এম.কে-র ১৮ জন সদস্য জোট-সরকারের প্রতি সমর্থন জানাতে অস্বীকার করে। রাষ্ট্রপতি নারায়ণন্ প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীকে আস্থা ভোট গ্রহণের নির্দেশ দান করেন। আস্থা ভোট গ্রহণের প্রস্তাব যখন লোকসভায় পেশ করা হয় তখন মাত্র ১টি ভোটে বাজপেয়ীর জোট-সরকার পরাস্ত হয়। তত্ত্বাবধানকারী সরকার হিসাবে এই জোট-সরকার ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যায়।

ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। নির্বাচনের আগেই জোট-রাজনীতির ব্যাপকতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান জোট গড়ে উঠতে দেখা যায়। প্রথমত, বি.জে.পি-র নেতৃত্বে যে জোট গড়ে ওঠে তা National Democratic Alliance (NDA) নামে পরিচিতি লাভ করে। এই জোটে প্রায় ২৩টি দল এবং গোষ্ঠী সামিল হয়। একটি সাধারণ নির্বাচনী ইস্তাহারের ভিত্তিতে এই জোট নির্বাচনী প্রচার কাজ শুরু করে। দ্বিতীয়ত, কংগ্রেস দল পুরোপুরিভাবে জোট গঠন করতে ব্যর্থ হোলেও সি.পি.আই, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (RJD), বহুজন সমাজ পার্টি (BSP), এ.আই.এ.ডি.এম.কে ইত্যাদি দলগুলির সঙ্গে নির্বাচনী বোঝাপড়া গড়ে তোলে। তৃতীয়ত, বামপন্থী জোট গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দেয় CPM-এর নেতৃত্বাধীনে। বাস্তবে অবশ্য এই সম্ভাবনা তেমন সফলতা লাভ করেনি।

নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যায় যে, NDA জোট মোট ২৯৬টি আসন লাভ করেছে। পরবর্তীকালে আরও কিছু গোষ্ঠী এই জোটে যোগদান করায় NDA জোট মোট ৩০৪ জন সাংসদের সমর্থন লাভে সক্ষম হয়। ১৩ ই অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে প্রায় ৭০ জন সদস্যবিশিষ্ট জোট-সরকার প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে সপ্তম জোট-সরকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে ক্ষমতাসীন হয়।

NDA নেতৃত্বাধীন জোট-সরকার পূর্ববর্তী জোট-সরকারগুলি থেকে অনেকাংশে ব্যতিক্রম ছিল। প্রথমত, যদিও এই জোট-সরকার ডি.এম.কে, তেলেগু দেশম, তৃণমূল কংগ্রেস ইত্যাদি আঞ্চলিক দলগুলির কাছ থেকে নানা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় তবুও এই জোটসঙ্গীরা একসঙ্গে কাজ করতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম একটি জোট-সরকার স্থায়িত্বের পরিচয় দেয়। ফলে, পূর্ববর্তী জোট-সরকারগুলির সবথেকে বড়ো সমস্যা ছিল যে অস্থিতিশীলতা, তা দূর করতে সক্ষম হয়। তৃতীয়ত, এই জোটের মধ্যেও ভাঙ্গন দেখা গিয়েছিল যখন Pattali Makkal Katchi (PMK), তৃণমূল

কংগ্রেস প্রভৃতি শরিক দল সরকার থেকে তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তাদের অসহযোগিতা সংখ্যাগরিষ্ঠতা রক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করেনি। বরং মহিলা সংরক্ষণ বিল, সন্ত্রাসবাদ, প্রভৃতি স্পর্শকাতর বিষয়গুলিতে শরিক দলগুলি সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করতে সক্ষম হয়। এইসব কারণে NDA হোল প্রথম জোট-সরকার যা প্রায় পূর্ণ সময় অর্থাৎ পাঁচ বছর পর্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকতে সক্ষম হয়।

NDA জোট-সরকার নিজের জনপ্রিয়তা ও সফলতা সম্পর্কে কিছুটা অধিক আত্মবিশ্বাসী হোয়ে উঠেছিল। সম্ভবত এই কারণেই পূর্ণ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার ৮ মাস পূর্বেই ভোটের মাধ্যমে জনগণের মুখোমুখি হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ২০০৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে। এই নির্বাচনের প্রাক্কালেও মোটামুটিভাবে তিনটি বিকল্প জোট গড়ে উঠেছিল।

প্রথমত, কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে গড়ে ওঠেছিল United Progressive Alliance (UPA)। এই জোটের অন্যান্য সঙ্গীরা হোল ডি.এম.কে, রাষ্ট্রীয় জনতা দল (RJD), ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা (JMM) ইত্যাদি দলগুলি।

দ্বিতীয়ত, পূর্ববর্তী সফল জোট-সরকার NDA এই নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করে। এর শরিক দলগুলির মধ্যে প্রধান হোল শিবসেনা, ভারতীয় জনতা দল (BJD), তেলেগু দেশম, অকালি দল প্রভৃতি।

তৃতীয়ত, বামপন্থী জোটে শরিক দলগুলি হোল সি.পি.আই. (এম), সি.পি.আই, কেরালা কংগ্রেস, বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক পার্টি (RSP) এবং সর্বভারতীয় ফরওয়ার্ড ব্লক (AIFB)।

ভোটের ফলাফল ছিল কিছু অপ্রত্যাশিত। প্রথমতো, NDA জোটের পরাজয় অনেক রাজনীতিবিদ ও পর্যবেক্ষকের কাছে ছিল আশ্চর্যের বিষয়। ভোটের পূর্বে যে জনমতের সমীক্ষা নেওয়া হোয়েছিল তাতে এমন ফলাফল হোতে পারে বলে অনেকেই মনে করেননি। ক্ষমতাসীন সরকার-বিরোধী মনোভাব (Anti-incumbency) এই পরাজয়ের প্রধান কারণ হিসাবে অনেকে মনে করেন। একই সঙ্গে মতামত সমীক্ষার অনিশ্চয়তা প্রমাণিত হয় এই ফলাফলের মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, এই নির্বাচনের ফলাফল জাতীয় স্তরে বামপন্থী দলগুলির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। তিনটি জোটের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হল —

UPA– ২২০
NDA–১৮৭
বামফ্রন্ট—৬০
অন্যান্য—৭৩

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন UPA জোট সরকার গঠন করে এবং বামফ্রন্ট বাইরে থেকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এই জোট-সরকারের কার্যকাল তিন বছর পূর্ণ হোয়েছে। চতুর্দশ লোকসভা নির্বাচন তিনটি প্রধান কারণে গুরুত্বপূর্ণ — (১) এই নির্বাচন ত্রিশঙ্কু (Hung) সংসদের সৃষ্টি করে নি, (২) মোটামুটিভাবে সফল একটি জোট-সরকারকে পরাস্ত করে আর একটি জোট-সরকার স্থায়িত্বের প্রমাণ দিতে চলেছে। তাই নব্বইয়ের দশকে জোট-রাজনীতি সম্বন্ধে যে বিভীষিকা লোকেদের মনে সৃষ্ট হোয়েছিল তা অনেকাংশে দূরীভূত হোয়েছে এবং (৩) এই নির্বাচন প্রমাণ করেছে যে

রাজনৈতিক দল হিসাবে কংগ্রেসের প্রাধান্য শেষ হোয়ে যায়নি। অন্যভাবে বলা যায় যে, কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ ঘটেছে এই ২০০৪ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে।

১.৮ রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতি (Coalition Politics at State level)ঃ

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে মোট ২৮টি রাজ্য আছে। এই রাজ্যগুলির রাজনীতি দুভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। একদিকে রাজ্যগুলি পৃথকভাবে নিজেরাই এক সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে বলে সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে রাজ্যস্তরের রাজনীতির পর্যালোচনা করা যায়। অন্যদিকে রাজ্যগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে এক অখণ্ড ভারতীয় রাজনীতির পরিচয় বহন করে বলে মনে করা যেতে পারে। সুতরাং রাজ্যস্তরের রাজনীতি কেন্দ্রীয় বা জাতীয় রাজনীতি দ্বারা প্রভাবিত হোয়ে থাকে একথা সত্য। আবার একথাও ঠিক যে, কেন্দ্রীয় রাজনীতিও বৈচিত্র্যপূর্ণ্য হোয়ে ওঠে রাজ্যস্তরের রাজনীতির প্রতিফলনে। রাজনৈতিক মেরুকরণ বা জোট-গঠনের যে প্রবণতা ভারতীয় রাজনীতিতে দেখা গেছে তা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরে জোট সরকার গঠনের ক্ষেত্রে পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়া হিসাবে কাজ করেছে। ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচন যে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবর্তন এনেছিল তা শুধু কেন্দ্রে নয়, তার সঙ্গে অনেক রাজ্যেও কংগ্রেস দলের একাধিপত্য ক্ষুণ্ণ হোয়েছিল। যদিও কেন্দ্রে জোট সরকার আসতে এরপর আরও দশ বছর লেগে যায় (১৯৭৭), রাজ্যস্তরে কিন্তু জোট রাজনীতির বন্যা ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরেই শুরু হোয়ে যায়।

কেরালায় জোট-সরকার ঃ

প্রকৃতপক্ষে রাজ্যস্তরে কেরালায় জোট-রাজনীতির শুরু হয় ১৯৫২ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর। রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতির পর্যালোচনা তাই কেরালাকে দিয়েই শুরু করতে হয়।

কেরালায় ১৯৫২ সালে প্রথমে কংগ্রেস দলের নেতৃত্বাধীনে একটি জোট-সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৪ সালে আবার একটি জোট-সরকার ক্ষমতায় আসে যার নেতৃত্বে ছিল সি.পি.আই দল। এরপর ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে সি.পি.আই, সি.পি.আই (এম), মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলগুলি আরও কয়েকটি রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে মিলিত হোয়ে বামপন্থী নেতা নাম্বুদ্রিপাদের নেতৃত্বে জোট-সরকার স্থাপন করে। পরবর্তীকালে দেখা গেল যে, কেরালার রাজনীতিতে বামফ্রন্ট, কংগ্রেস দলের সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ইত্যাদি একের পর এক ক্ষমতাসীন হয়। ফলে, কেরালায় একক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসনের নজীর ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। ইদানীংকালে দেখা যায় যে, ২০০১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর কংগ্রেস দলের নেতৃত্বে সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (United Democratic Front) ক্ষমতায় আসে। আবার ২০০৬ সালের নির্বাচনের ফলাফল বামফ্রন্টের শাসন ফিরিয়ে আনে। বিধানসভার মোট ১৪০টি আসনের মধ্যে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (Left Democratic Front) ৯৮ টি আসন লাভ করে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সংযুক্ত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট লাভ করে ৪২ টি আসন। কেরালার জোট রাজনীতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল—(১) বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ফ্রন্ট পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় এসেছে ও ক্ষমতাচ্যুত হোয়েছে। (২) জোট-রাজনীতির সবথেকে বড়ো সমস্যা হোল সরকারের স্থিতিশীলতার অভাব। কেরালার জোট-রাজনীতিতে অবশ্য সরকারের স্থায়িত্বের অভাব বিশেষ দেখা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গে জোট-সরকার ঃ

পশ্চিমবঙ্গের জোট-রাজনীতির কিছুটা অভিনবত্ব আছে। ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের পরেই এখানে কংগ্রেস দলের প্রাধান্য কমে গিয়ে জোট-রাজনীতির আবির্ভাব ঘটে। ঐ বছরেই কংগ্রেস দল ত্যাগ করে চলে আসা নেতা অজয় মুখার্জী বাম দলগুলির সঙ্গে মিলিত হোয়ে জোট-সরকার গঠন করেন। ১লা মার্চ, ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়। অচিরেই দলগুলির মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয়। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জীর ভূমিকা নানাভাবে সমালোচিত হোয়েছিল। ১৯৬৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল ঘোষ তাঁর ১৭ জন অনুগামীদের নিয়ে যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে এসে Progressive Democratic Front (PDF) গঠন করেন। রাজ্যপাল Dharamvira অজয় মুখার্জীর সরকারকে বরখাস্ত করে প্রফুল্ল ঘোষের নেতৃত্বাধীন জোটকে সরকার গঠনের সুযোগ দেন। এই সরকার ছিল PDF ও কংগ্রেস দলের জোট। বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজয় ব্যানার্জী এই সরকারকে ক্ষমতাদানে অস্বীকার করায় রাজ্যপাল শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করার প্রস্তাব দেন। ১৯৭১ সালে বিধানসভা নির্বাচনে কোন দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় পুনরায় বাংলা কংগ্রেসের নেতা অজয় মুখার্জী সরকার গঠনের সুযোগ পান কংগ্রেস দলের সমর্থনে। এই সরকারও স্থায়ী হয়নি। ১৯৭১ সালে আবার রাষ্ট্রপতি শাসন জারী করা হয়। পরের বছর ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত স্থায়ী সরকার স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

১৯৭৭ সাল পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। ঐ বছরের বিধানসভা নির্বাচনে সি.পি.আই (এম) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু ঐ দল একা সরকার গঠন না করে অন্যান্য বামপন্থী দলগুলিকে নিয়ে বামফ্রন্ট গঠন করে। বামফ্রন্টের সরকার মোট ২৩০ জন বিধায়কের সমর্থন লাভ করে। এই যে বাম জোট-সরকারের সূচনা হয় তা আজও ধারাবাহিকভাবে প্রতিটি পাঁচ বছর অন্তর সরকার গঠন করে আসছে। ২০০৬ সালে যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে জয়লাভ করে উপর্যুপরি সাতবার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। ১৯৭৭ সালের পরে যে নির্বাচনগুলি অনুষ্ঠিত হোয়েছে সেগুলিতে বামফ্রন্টের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হোল ১৯৮২—২৩৮, ১৯৮৭—২৫১, ১৯৯১—২৪৫, ১৯৯৬—২০৩, ২০০১—১৯৯ এবং ২০০৬—২৩৫। পশ্চিমবঙ্গের জোট-রাজনীতি এভাবে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে শুধু এই রাজ্যে নয়, সমগ্র ভারতীয় রাজনীতির জোট-সরকারের ইতিহাসেও।

বিহারে জোট-সরকার ঃ

জোট-সরকারের দৃষ্টান্ত বিহারে বহুবার দেখা গেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরূপ সরকার স্থায়ী হয়নি। বিহারের রাজনীতিতে ১৯৬৭ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা দেখা গেছে। অকংগ্রেসী দলগুলির সমর্থনে ১৯৬৭ সালে মহামায়া প্রসাদ সিং সরকার গঠন করেন। এই সরকারের পতনের পর বি. পি. মণ্ডলের মন্ত্রীসভা ক্ষমতায় আসে। ১৯৬৮ সালে ভোলা পাসওয়ানের মন্ত্রীসভা ক্ষমতাসীন হয় যাতে যুক্তফ্রন্ট ও অন্যান্য কিছু গোষ্ঠী সামিল হয়। ১৯৬৯ সালে যে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাও স্থায়ী সরকার গঠন করার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারেনি। অতঃপর শুরু হয় বিভিন্ন জোট মন্ত্রীসভার আসা যাওয়া। প্রথমে হরি সিং-এর সরকার, দ্বিতীয়ত, ভোলা পাসওয়ান-এর মন্ত্রীসভা, তৃতীয়ত, দারোগা রাই-এর সরকার, চতুর্থত, কর্পূরী ঠাকুরের জোট সরকার এবং পঞ্চমত, পুনরায় পাসওয়ানের জোট-সরকার। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার সমাপ্তি

ঘটে ১৯৭২ সালে যখন কেদার পাণ্ডের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৭৭ সালে ভারতীয় লোকদল (BLD) এবং জনসংঘের জোট ক্ষমতা ভোগ করে কিছুদিনের জন্য। ১৯৯০ সালে যে জোট-সরকার লালু প্রসাদের নেতৃত্বে ক্ষমতায় আসে তা স্থায়ী হয় এবং পরবর্তী ১৯৯৫ সালের নির্বাচনে লালু প্রসাদের জনতা দল বিহার রাজনীতিতে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনে, কারণ এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সুদীর্ঘ দশ বছর পর ২০০৫ সালের বিধানসভা নির্বাচন পুনরায় জোট-সরকার গঠনের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বর্তমানে নীতিশ কুমারের নেতৃত্বে জনতা দল (united) এবং বি.জে.পি-র জোট-সরকার বিহারে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত।

পাঞ্জাবে জোট-সরকার ঃ

১৯৬৭ সালের নির্বাচন পাঞ্জাবেও জোট-রাজনীতির সূচনা করে। ১৯৬৭ সালে অকালি-জনসংঘ জোট ক্ষমতায় আসে। কিন্তু জোটসঙ্গীদের মধ্যে মতপার্থক্য ও অকালি দলের ভাঙন এই সরকারকে স্থায়িত্ব দিতে পারেনি। ১৯৬৯ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর অকালি দল বৃহত্তম দল হিসাবে সরকার গঠন করে। অকালি নেতা গুরণাম সিং মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন এবং জনসংঘ এই সংখ্যালঘু সরকারকে সমর্থন করে। অকালি দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে গুরণাম সিংকে সরিয়ে প্রকাশ সিং বাদল ক্ষমতা দখল করেন। এই কারণে ১৬ জন বিধায়ক মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন তুলে নেওয়ায় বাদল জোট-সরকারের পতন ঘটে। ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস সরকার শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী নির্বাচনে ১৯৭৭ সালে যদিও অকালি দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তবু কেন্দ্রে সেইসময় যে জনতা সরকার ছিল তার প্রতি সমর্থন প্রকাশ করে রাজ্যেও জনতা দলের সঙ্গে জোট সরকার গড়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস দলের সরকার ক্ষমতায় আসে। ১৯৯৭ সালে পুনরায় অকালি-বি.জে.পি জোট ক্ষমতা দখল করে। এই সরকার পাঁচ বছর স্থায়ী হয়, যার পর আবার কংগ্রেস দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে।

হরিয়ানায় জোট-সরকার ঃ

হরিয়ানায় জোট-রাজনীতির অভিজ্ঞতাও তিক্ত। পৃথক রাজ্য হিসাবে ১৯৬৬ সালে স্বীকৃতি পাওয়ার পর এখানে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শর্মার সঙ্গে দলীয় সদস্যদের মনোমালিন্য হয়। ১৪ জন কংগ্রেস সদস্য বিরোধী দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হরিয়ানা কংগ্রেস দল গঠন করে এবং এক যুক্তফ্রন্টে সামিল হয়। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস দলের শাসন চলে। ১৯৭৭ সালে দেবীলালের নেতৃত্বে একটি জোট-সরকার ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু দলত্যাগ প্রবণতা হরিয়ানার রাজনীতিতে সমস্যার সৃষ্টি করে। ফলে জোট-সরকারের পতন ঘটে। ১৯৮৭ সালে লোকদল ও বি.জে.পি-র জোট সরকার গঠন করে এবং মুখ্যমন্ত্রী হন দেবীলাল। পরে যখন চৌতালা মুখ্যমন্ত্রী হন তখন বি. জে. পি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় জোট-সরকারের পতন হয়। এর পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস দলের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। পুনরায় ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের পর জোট-সরকার ক্ষমতায় আসে। এই জোটে সামিল ছিল বংশীলালের হরিয়ানা বিকাশ পার্টি, বি.জে.পি ও কিছু নির্দল বিধায়ক। অনতিবিলম্বে এই সরকারের পতন হয় যখন বি. জে. পি সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। এরপরেই চৌতালার নেতৃত্বে আবার একটি জোট-সরকার গঠিত হয় যার স্থায়িত্বকাল ছিল ছ'মাস।

উপরোক্ত রাজ্যগুলি ছাড়াও ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, অরুণাচল প্রদেশ, গোয়া, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যগুলিতেও বিভিন্ন সময়ে জোট রাজনীতির আবির্ভাব দেখা যায়। জোট রাজনীতির অভিজ্ঞতা প্রায় সর্বত্রই এক। রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধান, নীতিগত ও দলীয় শৃঙ্খলার অভাব, সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা, স্বজন পোষণ ইত্যাদি নৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা দলত্যাগ করার প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। ফলে জোট সরকারগুলি স্থায়ী হয়নি। ১৯৬৭-১৯৭১ সাল পর্যন্ত জোট রাজনীতির বিশ্লেষণ ডঃ সুভাষ কাশ্যপ রচিত "The Politics of Power" গ্রন্থে পাওয়া যায়।

রাজ্যস্তরে যে জোট রাজনীতির পরিচয় পাওয়া যায় তার সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন। জোট-রাজনীতির নিম্নলিখিত পরিণামগুলি বিশেষভাবে লক্ষণীয় ঃ

প্রথমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে জোট সরকার মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করেছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর যে ভাবমূর্তি বিভিন্ন রাজ্যে দেখা গেছে জোট রাজনীতি তা বিনষ্ট করেছে। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে এর জন্য স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও দায়ী ছিলেন একথা অস্বীকার করা যায় না।

দ্বিতীয়ত, মুখ্যমন্ত্রীর পদমর্যাদার হানির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে রাজ্যপালের অতিমাত্রায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার সমস্যা। রাজ্যের জোট রাজনীতি প্রমাণ করেছে যে, উপযুক্তভাবে বিবেচনা না করে রাজ্যপাল নিয়োগ করার ব্যাপারটি কিরকম সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। উচ্চাভিলাষী ও সক্রিয় দলীয় সদস্যদের মধ্য থেকে রাজ্যপাল নিয়োগ করলে জোট রাজনীতিতে রাজ্যপাল বনাম মুখ্যমন্ত্রী সংঘর্ষ অনিবার্য।

তৃতীয়ত, রাজ্যস্তরে জোট-রাজনীতি কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেক সময়, কেন্দ্রীয় নির্দেশ রাজ্য সরকার উপেক্ষা করেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালার ক্ষেত্রে দেখা গেছে।

পরিশেষে, জোট-রাজনীতির এক সাধারণ পরিণতি হোল রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা। এই সমস্যার জন্য রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হোয়েছে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটেছে।

১.৯ ভারতে জোট-রাজনীতির মূল্যায়ন ঃ (Evaluation of Coalition Politics)

ভারতীয় রাজনীতিতে একসময় জোট-রাজনীতিকে ব্যতিক্রম বলে মনে করা হোত। কিন্তু ধীরে ধীরে জোট-রাজনীতির প্রবণতা ও অনিবার্যতা কেন্দ্র ও রাজ্যস্তরে বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বভাবতই, জোট রাজনীতির নেতিবাচক ও ইতিবাচক দিক দুটি বিবেচনা করে এবং ভারতীয় জোট রাজনীতির অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জোট রাজনীতির মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হোয়ে উঠেছে। জোট-রাজনীতির বিপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া যেতে পারে, সেগুলির মধ্যে প্রধান হোল—

প্রথমত, ভোটদাতারা যে ধারণার বশবর্তী হয়ে ভোট দিয়ে থাকেন জোট-সরকারে অনেক সময় তা সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের পূর্বে নির্বাচনী ইস্তাহারের ভিত্তিতে প্রচার করে থাকে। ভোটদাতারা এই কর্মসূচীর ভিত্তিতেই তাদের পছন্দের প্রার্থী ঠিক করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু জোট গঠনের ফলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হোতে পারে যে একজন ভোটদাতা যে দলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন, সেই দলের সঙ্গেই তাঁর পছন্দের প্রার্থী বা দল জোট গঠন করল।

সুতরাং ভোটদাতার কাছে ভোটদানের মূল উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হোয়ে গেল। এই সমস্যা বড়ো করে দেখা যায় যখন বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী দলগুলি জোটসঙ্গী হয় এবং জোট গঠন করা হয় নির্বাচনের পরবর্তীকালে।

দ্বিতীয়ত, সংসদীয় গণতন্ত্রের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বের একটি ব্যক্তিগত দিক আছে কিন্তু সমষ্টিগত দিকটিই বেশী গুরুত্বপূর্ণ। জোট রাজনীতি কিন্তু এই যৌথ দায়িত্বশীলতার অবমাননা করে। সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রীদের কিছু প্রয়োজনীয় আচরণবিধি আছে যা জোট-রাজনীতিতে উপেক্ষিত হয়। আইন বিভাগের ওপর শাসন বিভাগের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় জোট-রাজনীতিতে। মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা যেন বড়ো করে দেখা হয়। জোট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী তাঁরই ক্যাবিনেট মন্ত্রী জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন। এটি কোন্ শ্রেণীর সংসদীয় গণতন্ত্রের দৃষ্টান্ত তা বিশেষভাবে বিবেচনা করার বিষয়।

তৃতীয়ত, জোট-সরকারে ক্যাবিনেটের উপর এক সুপার ক্যাবিনেট গড়ে ওঠে। পার্লামেন্টারী সরকারে ক্যাবিনেট হোচ্ছে রাজনৈতিক তোরণের প্রধান প্রস্তর। কিন্তু জোট সরকারে ক্যাবিনেটের থেকে আরও শক্তিশালী এবং বড়ো ক্যাবিনেট হয়ে দাঁড়ায় জোটের Coordination Committee বা সমন্বয় সাধনকারী কমিটি।

চতুর্থত, জোট-সরকার ভারতীয় রাজনীতিতে অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রে NDA এবং এ পর্যন্ত UPA (২০০৭) ছাড়া এবং রাজ্যস্তরে পশ্চিমবঙ্গের বামজোট ব্যতীত অধিকাংশ জোট সরকার ক্ষণস্থায়ী বলে প্রমাণিত হোয়েছে।

পঞ্চমত, ত্রিশঙ্কু আইনসভার জন্যই জোট-রাজনীতির উদ্ভব ঘটেছে। ভারতীয় রাজনীতিতে এই পরিস্থিতি অসাধুতার প্রশ্রয় দিয়েছে, গোটা সমাজে দুর্নীতির পথ প্রশস্ত করেছে। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চাকে ঘিরে (JMM) ঘুষ কেলেঙ্কারী বা বিহারে বিধায়কগণের লোকজনশক্তি পার্টি ছেড়ে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রমাণ করে জোট-সরকার কতোখানি দুর্নীতিপ্রবণ। দুর্নীতির সঙ্গে আবার অনেক সময় দেখা যায় জোট-সরকারে দক্ষতার অভাব। জোটসঙ্গীদের কাছে দলীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থ জাতীয় বা আঞ্চলিক স্বার্থ অপেক্ষা বড়ো বলে মনে হয়। জোটসঙ্গীদের মধ্যে সংঘর্ষের জন্য উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মসূচী অবহেলিত হয়।

ষষ্ঠত, পার্লামেন্টারী সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হোল রাজনৈতিক সমরূপতা (Political homogeneity)। এই সমরূপতা রক্ষার চেষ্টা করা হোয়ে থাকে অভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে। জোট-সরকারের ক্ষেত্রে সাধারণ ন্যূনতম কর্মসূচীর (Common Minimum Programme) ভিত্তিতে জোটসঙ্গীরা ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু এই কর্মসূচীর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকে। Civil Service Times (March 2007) পত্রিকায় অধ্যাপক রাকেশ সিং এক বিবৃতিতে এই "Common Minimum Programme"-কে ব্যঙ্গ করে "Confused Maximum Prohibition" বলে অভিহিত করেছেন। কারণ যেহেতু জোটসঙ্গীদের মধ্যে নীতি বা মতাদর্শ ব্যাপারে কার্যকর সামঞ্জস্য থাকে না, সেহেতু অতি সহজেই পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা দেয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যেতে পারে যে, বর্তমান কেন্দ্রের UPA জোট সরকার অর্থনৈতিক উদারীকরণ নীতি কার্যকর করতে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক কিন্তু জোটসঙ্গীদের মধ্যে বাইরে থেকে সরকারকে সমর্থন করছে যে বামপন্থী দলগুলি তাদের